কাহার পাড়ার গান

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথার অবসান হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ছোট জমিদার ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি তাঁর প্রাপ্য অংশের অনেকটাই তৎকালীন সর্বোদয় নেতা বিনোবা ভাবের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

গ্রামীণ সমাজে কৃষকদের ভেতর সমকালে মাঠে চাষের কাজের পাশাপশি কল-কারখানার শ্রমিক হওয়ার ক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করে একটি ভেদরেখা অঙ্কিত হয়েছিল। বনোয়ারী আর করালী সেই ভেদরেখার দুপারে অবস্থান করছে। আসলে তারাশঙ্কর সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তনটিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন আপনার সমগ্রতা দিয়ে। জাতিভেদের, অশিক্ষা-কুশিক্ষার, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জমিদার - উন্নত ধনী - সদ্‌গোপ-ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা দূরে সরিয়ে রেখেছিল হাড়ি - বাউরি-বাগদি - কাহার প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষজনকে। চণ্ডিমণ্ডপের অন্দরে এইসব অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ফলে দেশ - গাঁয়ে কলেরা দেখা দিলেও মুচিদের শবদেহ তুলতে অস্বীকার করে বাউরিরা, কাহারদের নিজেদের ভেতরও থেকে যায় 'আটপৌরে' এবং 'পালকিবাহক' সম্প্রদায়ের বিভাজন। এগুলো খুব কাছ থেকে খুব নিখুঁতভাবে দেখেছেন তারাশঙ্কর। গ্রামীণ তথাকথিত অন্ত্যজদের মধ্যেও এই বিভাজন দেখা গেছে।

কৃষকদের জীবনে ছিল যুগযুগান্তরের ভীতি, সংকট। হাঁসুলিবাঁকের কাহারপাড়ায় ছিল বহু ধরনের ভয়। জমিদারকে ভয়, সদগোপ মনিবকে ভয়, দোকানদারের জটিল হিসাবকে ভয়, কোঠাবাড়ি তৈরি করার ভয়, চন্ননপুরের ব্রাহ্মণদের ভয়। এ ছাড়াও আছে কালারুদ্রের ভয়, বেলগাছের ব্রহ্মদত্যির ভয়, পবন নন্দনের ভয়, পিতৃপুরুষের ক্রোধের ভয়। পৃথিবীতে যা আশ্চর্য, তাই হাসুলি বাঁকের দরিদ্র সংস্কারাচ্ছন্ন তারাশঙ্কর একেবারে অপরিবর্তনীয় সত্য বলে কখনই গ্রহণ করেননি, সমকালীন পরিবর্তনের ঢেউটিই আসলে — সেইই সত্য।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলার গ্রামীণ জনজীবনের মূল ভিত্তি কৃষি ও কৃষক। এই কৃষক সমাজের কথা ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে যথেষ্ট মূল্যবান, তারাশঙ্করের তুলিতে তা আঞ্চলিক হয়েও সর্বভারতীয়ত্বের গুণে গুণান্বিত। প্রত্যয়ী লেখক এ অঞ্চলের মানুষকে জেনেছিলেন একেবারে গভীর থেকে, ওদেরই একজনের মত হয়ে। পাপপূণ্যে ভালমন্দে শুভাশুভে মেশানো রক্তমাংসের দেহধারী শ্রমজীবী মানুষগুলোর অন্তর থেকে সাক্ষাত দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন তিনি। তাই তারা জনগণ নয়, গণদেবতা। অকপট সত্যনিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার সারল্যে তিনি সহজে গ্রামের এইসব উপেক্ষিত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী মানুষগুলোর কথা জোরের সঙ্গেই বলেছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তোমার মতন গাঁয়ের মানুষের কথা আগে কেউ বলেনি।'

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে লৌকিক ও আঞ্চলিক উপাদান সংগ্রহ, লোককথা - উপকথা-কিংবদন্তী - গান - গাথা প্রভৃতি সহ লোকসংস্কৃতির নানান উপাদান বিবেচনা করাই ছিল তারাশঙ্করের গ্রাম পরিক্রমার প্রধান কাজ। জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ বা গেজেটিয়ার পড়ার তখন কোন প্রশ্নই ছিল না। তাই হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় গাজন-ভাদু-ভাজো-ঝুমুর-চড়ক সবই এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। এই লোকগানের ভেতর দিয়েও লোকজীবনের অন্তরঙ্গ সুর শোনা যায়, আবার চরিত্র এবং চিত্রগুলিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলো - পাখির উজ্জ্বল চোখের মতন।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের কয়েকটি গান ও প্রবাদ ছড়া—

(১) সুরৎ করে চলে যাব গিরগিটির মতন
চোখে চোখে রাখবি কতক্ষণ!
(—বনওয়ারীর কথা)

(২) সায়েব লোকের লেগেছে লড়াই
ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উল্‌খাগোড়াই।
(—মুকুন্দ ময়রার বাঁধু ঘেঁটুগান)

(৩) তাই ঘুনাঘুন—বাজে লো নাগরী—
ননদিনার শাসনে, —চরণের নূপুরে থামিতে চায় না।
ঘরে থামিতে মনো চায় না। ও-তাই —তাই ঘুনাঘুন।
(—বনওয়ারীর বাঁধা ঘেঁটুগান)

(৪) হায় কলিকালে, কতই দেখালে—
দেবতার বাহন পুড়ে মল অকালে, তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতি বাড় বাড়িল যারা তাদের ভে-ঙে পাড়ো।
(—আটপৌরেদের বাঁধা ঘেঁটুগান)

(৫) বিচার নাহি বাবা পুরিল পাপের ভয়
সাঁজের পিদিম বল ফুঁ নিভাল কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধুজনের এ কি লীলা সন্‌ঝে বেলাতে।
মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় হায় কি গলাগলি
কত হাসিখুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি!
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সন্‌ঝে দেখালে হায় কালিকালে—
(বনওয়ারী বটতলায় সন্ধ্যাবেলায় কালোশশীর সঙ্গে একটু ইয়ে করেছিল। কেউ দেখেছিল নিশ্চয়। সেই দেখেই মাতব্বর বনওয়ারীকে নিয়ে ঘেঁটু গান বেঁধেছে আটপৌরেরা। শুনে তার চক্ষুস্থির।)

(৬) চোখের জলে লরম হল মাটি—
সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিতি!
(—নসুবালার বলা ছড়া)

(৭) লষ্ট চাঁদের ভয় কিলো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে—
কলঙ্কিনী রাইমানিনী— নাম রটেছে দ্যাশে দ্যাশে।
(—নসুবালার গাওয়া গান)

(৮) শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে
ঝাঁপ দিব সই কালীদহে,
কালীনাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যাযে!
(—গায়ক পাগল কাহার। নসুবালার গানের সুর ধরে সে গেয়েছে নন্দী বেশে। জাথায় জটা, হাতে ত্রিশুল— কিন্তু মহাদেব নয়, গাজনের সঙের নন্দীর বেশ।)

(৯) পেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না—
হায় সখি গো—সনজে হল ঝিঙের ফুল কই ফুটল না!
(—পাগল কাহারের গান)

(১০) মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে—
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমাকে ফিরে হে!
(—পাগল কাহাদের গান)

(১১) ও সায়ের আস্তা বাঁধালে!
হায় কলিকালে!
কালে কালে সায়ের এসে আস্তা বাঁধালে—
(ছোকরাদের ধুয়ো)
ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে
ও সায়ের আস্তা—
(—পাগলা কাহারের বাঁধা ঘেটুগান। চন্ননপুরে যখন প্রথম রেল লাইন বসে, তখন এটি বেঁধেছিল সে। আজও কাহারেরা তাই গায়।)

(১২) লালমুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ
—দ্যাশ - বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক—
—ও সায়েব আস্তা—
ও সায়েব আস্তা বাঁধালে—কাহার-কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবুলোক।
—ও সায়েব আস্তা—
(—পাগলের বাঁধা ও গাওয়া ঘেঁটু গান।)

(১৩) জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।
মেয়েরা ও-পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে—
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে।
লক্ষ্মীরে চঞ্চল করে অলক্ষ্মীর কারখানা
ও-পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।
(—পাগলের বাঁধা এবং গাওয়া গান।)

(১৪) গোপনে, মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়,
ও হায় ঠাণ্ডা শেতল সাঁজবেলায়
(পাগলের গান।)

(১৫) আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিল না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে—
টলোমলো—টলোমলো—
হায় বঁধু হে পড়ে গেল—
ও হায়, চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে ঝলে না।
(—কালোশশী তথা পরমের 'কালোবউ'-এর সঙ্গে বনওযারীর আশনাই। কালো বউ-ওর গাওয়া গান।)

(১৬) হাঁসুলি বাঁকের বনওযারী—যাই বলিহারি,
বাঁধিল নতুন ঘর দখিনদুয়ারী।
সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরি রে মরি।
(—সুবাসীকে নতুন করে বিয়ে করে ঘরে আনে বনওযারী। সেই নিয়ে হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় গান গায় সুচাঁদ বুড়ি।'

(১৭) অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায়রে!
অন্ধকারেই পরানপাখি সেই দ্যাশেতে যায়রে!
চন্দ সূর্য্য লক্ষ পিদিম তাই রে নাই রে নাই রে।
না থাক, আছে একজনা ভাই,
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়
দুই চোখে তার দুইটি পিদিম আঁধারে রোশনাই রে
আলোর তরে ভাবনা কেনে হায় রে।

(—নয়ানের মৃতুর পর গান বেঁধেছে পাগল কাহার!)

(১৮) হাঁসুলি বাঁকের বনোয়ারী, যাই বলিহারি—
বাঁধিল নতুন ঘর দখিন - দুয়ারী।
সে ঘর বাঁধিতে এল (যত সব) অষ্ট পহরী।
অষ্টপহরী পাড়ার সুবাসী-লতা
কাহার পাড়ায় আজ হল পোঁতা।
বুড়ো মালী বনোওয়ারী যেতেন সাজায় কেয়ারী।
সুবাসী - লতার ফুল পরিবে কানে
সুবাস জাগিবে রস বুড়ানো প্রাণে
ও পথে যাস না তোরা বারণ করি—
(বুড়া আসবে তেড়ে,
ঘেঁটে হাতে বুড়ো আসবে তেড়ে)

(—ঢুক্‌ঢাক্ মদ খেলে আর গান গাইলে বেঁধে বেঁধে পাগল কাহার। বনওয়ারীর প্রথম স্ত্রী গোলাপীবালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। রঙের কালোশশী দহের জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। বনওয়ারীর সাঙা হল আটপৌরে কন্যে সুবাসীর সঙ্গে।

(১৯) 'ল' লড়লাণ—'ল' চাড়লাম
'ল' পুরনোয় ঘর বাঁদলাম
লতুন বাখার বাঁধি পুরোনো খাই—
এই খেতে যেন জনম যায়—
লতুন বস্তু পুরোনো অন্ন—
তোমার কৃপাতে জন্ম ধন্য।

(—কালারুদ্দু বাবা ঠাকুরের কাছে নবান্নের ছড়া।)

(২০) ও লবানের লতুন ধানের পিঠে—
আজ কাজ কি মাঝের ঝোলে!
লতুন কাপড় খস্‌খসিয়ে বউরা এনেছে—
আঙা লতুন ছাওয়াল লিয়ে কোলে!

(—পাগলের বাঁধা লবান্নের গান।)

(২১) মন চাহে যাও হে তুমি —আমি যাইব না—
কেলি - কদমতলায়, বৃন্দে গো!
মানিক পেলে তুমিই লিয়ো— আমি চাইব না—
কালোমানিক কালায়, বৃন্দে গো!

(—পাগলের বাঁধা গান)

(২২) কোন্ ঘাটতে লাগায়েছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখি হে!
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলিরই বাঁকে—
বাঁশবনে কাশবনে লুকাল্‌ছ কোন ফাঁকে!
ইশারাতে দাও গো সখি সাড়া
তোমার আ-ঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে!

(—পাগল কাহারের বাঁধানো ভাঁজো গান।)

(২৩) ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা
আল্‌তার অঙের ছোপ মাটিতে দিব,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমার ধর লো ধরা।

(—মন্তরের মত ভাঁজো গান। পাগলেরও কিছু যোগ আছে এতে।)

(২৪) যে অঙ্গ আমার ভেসে গেল,
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ্গ যেয়ে লেগেছে সই
লাল শালুকের ফুলে হে!

(কোপাই নদীর জলে হে!)

সেই শালুকে মন মানালাম
সকল দুখো পাসরিলাম
তোমার মনের অঙের মলা
তুমিও দিয়ো ফেলে হে!

(কোপাই নদীর জলে হে!)

(—গান গাইছে পাগলা কাহার। মেয়েরা নাচছে। পাগলেরই বাঁধা গান।)

(২৫) হাঁসুলিবাঁকের কথা— বলব কারে হায়?
কোপাই নদীর জলে— কথা ভেসে যায়
যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশের হয় বাঁশি
বাঁশবাদির বাঁশগুলিরে তাই তো ভালবাসি।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়ার খেলা দেখে যা রে ভাই।

(—পাগলের বাঁধা গান। বনওয়ারীর অন্তিম শয়ান উপলক্ষে। সুচাঁদ বলে যায় এই উপকথা।

(২৬) বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার - কুলের পিতা
বাঁশ বনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা।
পরাণ - ভ্রমরে সে থাকত আগুলি,
(ও হায়) তারে দাহন করে মারল করালী।
বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার - কুলের পরাণ-ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ার ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি—
কাহারেরা, হায় রে বিধি, হল ভ্রমণকারী।
ঘর-ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়!

(—নসুবালা নাচতে নাচতে উপকথার-ই গান গায়।)

(২৭) যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে, যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে;—
ভাঙাগড়ার কারখানাতে, তোরা, দেখে আয় রে উঁকি মেরে।

(—পাগলের মনে নতুন কাহারপাড়া হবে শুনে নতুন গান এসেছে। করালী বালি খুঁড়ছে।)

(২৮) তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী
ননদিনীর শাসনে, চরণের নূপুর থামিতে চায় না।
তাই ঘুনাঘুন্—তাই ঘুনাঘুন্!

(—হাঁসুলির বাঁকে গাইতি চালিয়ে মাটি খুঁজতে দেখেছে নসুবালা, সেই আনন্দে পায়ে নূপুর বেঁধে নেচে নেচে সে এই গান গেয়েছে। তার দুচোখে নতুন কাহারপাড়া গড়ে ওঠার স্বপ্ন।)

বাংলাদেশে নাটক ও নাট্যভিনয়ের আগে প্রচলিত যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে শ্রোতা-দর্শকদের আনন্দ দান করা হতো, তাতে গান থাকতো অবশ্যম্ভাবীভাবেই। এ্যারিস্টটল নাটকের ষড় অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গীতকে রেখেছেন। 'মেলোড্রামা' কথাটি এসেছে— মেলোডি এবং ড্রামার সহযোগে। গ্রীক নাটক এবং শেক্সপীয়ারের নাটক ও আধুনিক প্রাচ্য - পাশ্চাত্য নাটকেও সঙ্গীতের যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক নাটকের ট্র্যাজেডিকে বলা হয়েছে 'Goat Song' বা 'ছাগ-সঙ্গীত'। অবশ্যই কাহিনীর প্রয়োজনে চরিত্রের বিবেক হিসেবে সঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে থাকে। কোথাওই সঙ্গীতের প্রয়োজনে চরিত্রের কাহিনীকে ব্যবহার করা হয় না।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাস অনেকটা রূপকথার প্যাটার্নে গড়ে উঠলেও নাট্যগুণ তারাশঙ্করের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গুণ, যা এখানেও উজ্জ্বল আলোর মতই দীপ্যমান। এখানে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপ চরিত্র নসুবালা, গাজনে সঙ সাজা পাগল কাহার বা উপকথার গান গাওয়া আশি বছরের সুচাঁদ বুড়ি কিংবা প্রেমে পাগল কালোশশীকে দিব্যি মানিয়ে যায়। বরং বলা যায় এইসব চরিত্রগুলি গান ও ছড়ার মাধ্যমে নিজের এবং নিজস্ব প্রতিবেশের এক অপরূপ সুলুক সন্ধান দিয়েছে যা কিনা কথা বলে ঠিক ততখানি প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তারাশঙ্কর এ ছবি গাঁয়েই দেখেছেন, শ্রমজীবী গরীব মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই গান গেয়ে—ছড়া কেটে জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও উত্তর দিয়ে থাকে, জীবনকে নাট্যগুণান্বিত করে তোলে। সঙ্গীত যেখানে ঘটনা ও চরিত্রের গতিবেগ পরিস্ফুটনে কোন সহায়তা করে না, সেখানে স্বতন্ত্রভাবে তা যতই সুমধুর হোক না কেন— কাহিনীর মধ্যে তার কোন মূল্যই নেই। আবার যেখানে সঙ্গীত কাহিনীর অনুগামী না হয়ে অগ্রগামী হতে চেষ্টা করে, অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং অতিরিক্ত আতিশয্যের দ্বারা কাহিনীর স্বাধীন বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, সেখানে সঙ্গীত বিপদ হয়েই দেখা দেয়। কারণ কাহিনী বিন্যাসে সঙ্গীতের ব্যবহার কখনোই অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশ, ভাবোচ্ছ্বাস, অবদমিত কামনা - বাসনার প্রকাশ, উত্তেজনা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত এক ধরনের স্বগতোক্তি, সাহিত্যের কথা - কাব্য তথা আষাঢ়িয়া 'কাহানি'র আদলে প্রকাশিত হয়, তখন সঙ্গীত তার অনেকটা অংশকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সে সঙ্গীত কাহিনীর মধ্যে তীব্র সঙ্গীত তার অনেকটা ঘনীভূত করে। অনেক সময় শুধুমাত্র আমোদ বা কৌতুক পরিবেশনের জন্যও গানের অবতারণা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেছেন— 'আমার কাহিনীর ক্ষেত্রে সঙ্গীত শুধু সঙ্গীত নয় নাট্য - সঙ্গীতের মতই তা 'কাহিনীসঙ্গীত'।

হাঁসুলি বাঁকের উপকথার সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছে পাগল কাহার। সে গান বাঁধে। তার মধ্যে স্বভাবকবিত্ব আছে। সে ঘেঁটু - গাজন -ভাঁজোর গানও বাঁধে। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে এমন সঙ্গীতকার আজও অমিল নয়। উপন্যাসটিতে পাগল কাহার বিবেকের মত কাজ করছে। আবার 'নসু'> নসুবালা ওরফে ভাদুর মা চিরকাল নারী সেজেই রয়ে গেল, অথচ সে পুরুষ নসুরাম > লসো। তার মত টাইপ চরিত্রের মুখে গান বা ছড়া চরিত্রটিকে যথেষ্ট জীবন্ত করে তুলেছে। অন্যদিকে কালোশশী তথা কালো বউ-এর মনে 'রঙ' ধরেছে, তার আর ঘরের প্রতি টান নেই, চন্ননপুরের বাবুদের ছেলের সঙ্গেও তার মেলামেশা নিচে। সেই সন্ধ্যাকালে বনওয়ারীর প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে প্রেমের গান শুনিয়েছে। পাখির ক্ষেত্রেও উচ্ছলতা কাম্য ছিল, কারণ সেই তো রঙের হলুদ পাখি। আবার সুচাঁদ বুড়িও কাহারপাড়ার উপকথা শোনানোর জন্য বসে আছে আশি বছর বয়সে, হয়তো নতুন কাহারপাড়াকে বরণ করার জন্যও। এই সমস্ত চরিত্রগুলির কণ্ঠে গান, পায়ে নাচের তাল দিয়ে লেখক 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে আরও জীবন্ত এবং বাস্তবানুগ ও গতিশীল করে তুলেছেন। এমন চরিত্ররা আজও গাঁয়ে - গঞ্জে আছে। তাদের অস্তিত্বের টের পাওয়া যায় এখনো আমাদের চারপাশে। কাজেই উপন্যাসটিতে সচেতনভাবেই ঘেঁটুগান, গাজনগান ইত্যাদি সংযোজন করে লেখক মহাকাব্যিক মাত্রার ক্ষেত্রে সার্থক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তথাপি সব গানই তারাশঙ্কর নিজের লেখা নাও হতে পারে, প্রচলিত গানের বহু কথা তিনি এইসব গানের অঙ্গে দিব্যি সুন্দরভাবে বসিয়ে দিয়েছেন।